27

19 SEP 1994

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...18 SEP 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

আবশ্বাস্য !

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, অনেক ক্ষেত্রের মতোই দেশে শিক্ষাক্ষেত্রেও কোন নীতি নেই এবং নেই প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরেই। কার্যত চলছে দেশে ব্রিটিশ আমলের নীতিই শিক্ষাক্ষেত্রেও। তার মানেই, চলছে ঔপনিবেশিক ও আমলাতান্ত্রিক নীতি। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের এ-উপনিবেশে নিজেদের শাসন-শোষণকে মজবুত ও পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যেই মূলত আমলা ও কেরানি সৃষ্টির প্রয়োজনেই একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল। '৪৭-এ দেশ বিভাগের পরেও প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও আমলাতান্ত্রিক নীতির তেমন কোন হেরফের হয়নি। তার কারণ, নতুন পাকিস্তানী শাসক-শোষকরাও এ অঞ্চলের মানুষকে পরাধীন ও পদানত রাখার লক্ষ্যেই তাদের সকল নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে থাকে।

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড; পৃথিবীর আলো-হাওয়ার মতোই শিক্ষার অধিকার মানুষের জন্মগত, মৌলিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার; এবং সে-অধিকার অলঙ্ঘনীয়; বস্তুত শিক্ষা হচ্ছে জনগণের সম্পদ— এ সমস্ত কথাই হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত জানা কথা। সবই নিরঙ্কুশ মহাসত্য এবং নিঃসন্দেহে নির্ভেজাল সুবচন। কিন্তু হলে কী হবে। আমাদের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে না। ফলে, এসবই নিহায়তই কিছু স্তোকবাক্য ও আপ্তবাক্য হয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজকে যেন ভেংচি কাটছে।

সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি ছাড়া, আদর্শহীন ও লক্ষ্যহীনভাবে কখনোই কোন সুব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। সেভাবে কোনো ব্যবস্থা যদি কিছু একটা গড়েও ওঠে, তা প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়ায় অব্যবস্থার নামান্তর; বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের আকর। সে ব্যবস্থা কখনও সুফলদায়ক হতে পারে না। কার্যত তা হয়ে দাঁড়ায় একটি বিষবৃক্ষমাত্র। তার ফলভক্ষণে জাতির সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য অর্জিত হতে পারেনা। নানাভাবে জাতিকে তা শুধু পিছিয়ে দেয়, ঠেলে দেয় অবক্ষয় ও ধ্বংসের দিকেই। শিক্ষাখাত-ই যে উন্নয়নের 'মাদার সেক্টর', বা মূল খাত— এটাতো অবিতর্কিত। সে-জন্যই দেশের সংবিধানে শিক্ষার মৌলিক গুরুত্বকে স্বীকার করাও হয়েছে। 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' হিসাবে ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ রাষ্ট্র গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করবে। আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে। সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করবে এবং সে-প্রয়োজনে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টি করবে। আর, আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সংবিধানের এসব চাহিদা ও বাধ্যবাধকতার আলোকেই দেশের শিক্ষানীতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। '৭২ সালের ৪ নবেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তারপর দীর্ঘ বাইশ বছরেও তার আলোকে দেশে কোনো শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার মতোই শুধু নীতির আগে নানান এলোপাতাড়ি কার্যক্রম গৃহীত হয়ে চলেছে। ফি বছর জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। প্রত্যেক বছর বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয়বৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে। আগেতো হয়েছেই, দেশ স্বাধীন হবার পরেও বিভিন্ন সরকারের আমলে গোটা চারেক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক কমিশনের রিপোর্টই শেষ পর্যন্ত হয় হিমাগারে চাপা পড়েছে, নাহয় পরিত্যক্ত হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা— জাতিসংঘের এই ঘোষিত শ্লোগানের সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে দড়িবাঁধা জোড়া পায়ে হাস্যকর লম্ফঝম্ফ করতে গিয়ে আমরা শুধু হোঁচট খেয়েই মরছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হলেও সারাদেশের দিকে তাকালেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থাটা সহজেই চোখে পড়বে। প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব, শিক্ষা-উপকরণের অভাব, শিক্ষকের অভাব— এটা হচ্ছে একটি সাধারণ অবস্থা। এর সঙ্গে আছে শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষাঅধিদফতর ও শিক্ষক নামধারী একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তির দুর্নীতি, অযোগ্যতা, দায়িত্বহীনতা, লোভ-লালসা ইত্যাদি। পরিসংখ্যানে দেখানো হয়, ৭০% শিশু নাকি স্কুলে যায়। শেষে উচ্চ শিক্ষার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছায় তার একেবারে নগণ্য অংশ। ড্রপ আউট বা ঝরে-পড়ার হার অত্যধিক এবং চরম লজ্জাকর অথচ রূঢ় একটি বাস্তব। নীতি ঠিক করার আগেই আরও সব কার্যক্রমের মধ্যে আছে সাম্প্রতিককালে শিক্ষাকাঠামো সংস্কারকমিটি গঠন। সে-কমিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর— এই চার স্তরের শিক্ষাকাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য ছয়টি পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে। সে-সুপারিশমালা সরকারের বিবেচনাধীন। কিন্তু শিক্ষা কমিশন রিপোর্টগুলোর মতোই এ-সুপারিশমালার ভাগ্যেও অন্যকিছু হবে বলে আশা করা যায়না।

এক মূঢ় ও ভ্রান্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই চলছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। চলছে কি? প্রকৃতপক্ষে, তাও অচল হয়েই রয়েছে। সেজন্যই দেশের ১২ কোটি মানুষের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৮০ লাখের ওপর। এঅবস্থা চলতে থাকলে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ২০০২ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১১ কোটি। এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা সীমাহীন। ভারত, শ্রীলঙ্কা, আশেপাশের সমস্ত দেশ এমনকি মালদ্বীপ পর্যন্ত সাক্ষরতা ও শিক্ষিতের হারবৃদ্ধিতে আমাদের ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। দেশের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে প্রায়ই শিক্ষাকে জীবনভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী করার কথা উচ্চারিত হয়। বলা হয়, নারীশিক্ষার প্রসারের কথা। কিছুসংখ্যক এনজিও'র আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলে এ-সবই শূন্যগর্ভ সুভাষণ বৈ কিছু নয়। ১৭ সেপ্টেম্বর চলে গেল মহান শিক্ষাদিবস। '৬২'র শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল ও একটি সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর দাবিতে আমাদের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ঐ দিবসের স্রষ্টা। কিন্তু বাবুল, মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ নামে যে-তরুনীরা সেদিন বুকের রক্তে ঐ দিবসটিকে রাঙিয়ে অমর করে রেখেছে, তাদের শ্রেণীর মানুষগুলো আজও শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারেনি। আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি ঐ আন্দোলনের মর্মবাণী। সন্ত্রাস, আর নীতিহীন ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের হাতে জিম্মি হয়ে রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। গণতন্ত্রের জন্য এত রক্তদানের পরেও এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই রূঢ় বাস্তবতা। যেকোন মূল্যে এর পরিবর্তন ঘটিয়ে সৃষ্টি করতে হবে নতুন কাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা। এবং তা গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার স্বার্থেই।